দৈনিক খবর

তারিখ 21 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

016

নিদ্রাহারী ভর্তি সমস্যার মূল

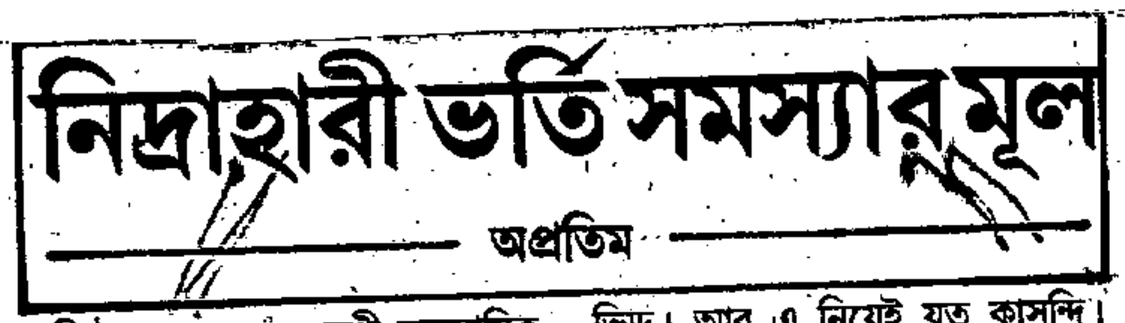

অপ্রতিম

মা-বাবার চোখে ঘুম নেই। অনেকের সুখতলি ক্ষয় হয়ে গেছে। তবু কূলের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কতো ধরাধরি ছুটাছুটি হচ্ছে এর লেখা-জোখা নেই। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করবেন মেয়েকে। মেয়ে পড়াশুনায় ভাল। যথেষ্ট মেধাবী। কিন্তু হলে কি হবে। ঠাঁই পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত হন্তা দিয়ে পড়েছেন এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে। কিন্তু তিনিও ফেল্। আর ভরসা কি? একমাত্র আশা যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় যার প্রভাব আছে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার উপর তাহলেই কেবল হতে পারে। খোঁজে পেতে বের করেছেন এক অধ্যাপিকাকে। কলেজ জীবনে অধ্যাপিকা আর স্কুল শিক্ষয়িত্রীর ছিল গলায় গলায় ভাব। কিন্তু এতোদিন পর। কে জানে, কথা রক্ষা হবে কি-না।

এ কোন কল্প-কাহিনী নয়। নীরেট বাস্তব। প্রতি বছর ভর্তি মৌসুমে একই দৃশ্যের অবতারনা হয়। পত্র-পত্রিকাগুলো সচিত্র প্রতিবেদন ছাড়াও প্রচুর লেখালেখি করে। আশা করা হয় যে, পরের বছর হয়তো অবস্থার কিছু উন্নতি হবে। কিন্তু তা আর হয় না। এ দেশের মহিমাই যেন এই। একবার কোন কারণে একটা সমস্যা সৃষ্টি হলে এর সমাধান হয় না। জট পাকিয়ে নতুন সমস্যাই শুধু সৃষ্টি করে।

সাং-বাৎসরিক এ ভর্তি সমস্যার হেতু কি? স্কুল সংখ্যা কম, ছাত্র সংখ্যা বেশী— না অন্য কিছু। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধির হারের আনুপাতিক বিচার করলে প্রথমটি বেশী হওয়ার কথা। কারণ, প্রতি বছরই স্কুল-যাত্রী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়ছে। অথচ স্কুল সংখ্যা সে হারে বাড়ছে না। কিন্তু বাংলাদেশের চালচিত্র ভিন্ন। এখানে ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়লেও পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সে হারে বাড়ছে না। এর কারণ অর্থনৈতিক। কবি বলেছেন, "সাধ ছিল যত, সাধ্য ছিল না।" সাধ যত থাক সাধ্য না থাকলে সে সাধের কোন মূল্য নেই। বিপুলসংখ্যক অভিভাবকের অবস্থা তাই। সাধ আছে ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেয়ার, কিন্তু সাধ্য নেই। তাই বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিরক্ষরই থেকে যায়। এরপরও ভর্তি সংকট তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে। এর কারণ ভাল স্কুলের অভাব।

মহানগরী ঢাকায় কম করে হলেও হাজারের উপর প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল আছে। এর কোনটি সরকারী, কোনটি বেসরকারী। একটা বিরাট অংশ কিণ্ডার গার্টেন। কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর পড়াশুনা মোটামুটি ভাল। তবে এগুলো যতোটা না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর চেয়ে বেশী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। শালা-শালিকে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করে প্রথমে স্কুল চালু করা হয়। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাড়াও পোস্টার ছাপিয়ে প্রচার করা হয় মহিমা। দু'তিন বছর না যেতেই উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তিন-চারটা স্কুলের মালিক হয়ে যান। শুষ্ক দেহ তেল চর্চিত হয়ে উঠে। খাতা-পত্রে নিয়ম-কানুন রক্ষা করা হলেও আসলে এ সব স্কুল সব নিয়মের উর্ধ্বে। বেতন-ফি ইত্যাদি অনেক বেশী। প্রথম শ্রেণীতেও মাসিক বেতন ৩০ টাকার কম নয়। এর উপর কত রকম ফি যে আছে এর ইয়ত্তা নেই। প্রায় প্রতি মাসেই কোন না কোন ফি দিতে হয়। পরীক্ষার সময় এত বেশী পয়সা আদায় করা হয় যা বলার নয়। সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার সময় নতুন ভর্তি ফি দেয়ার কথা নয়। কিন্তু এসব স্কুলে এক শ্রেণী হতে অন্য শ্রেণীতে উঠার সময়ও নতুন করে ভর্তি ফি দিতে হয়। বস্তুতঃ কিণ্ডার গার্টেনে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর পেছনে মাসে একশ' টাকার কম খরচ হয় না। বলা বাহুল্য শতকরা ৯০ জন মা-বাবারই এত ব্যয় বহন করার সামর্থ্য নেই। এর উপর আছে ভিন্ন সমস্যা। এসব স্কুলের বেশীর ভাগ ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এরপর ভিন্ন স্কুলে ভর্তি হতে হয়। তখন যে ধকল সহ্য করতে হয় সে ভয়ে অনেক মা-বাবা শুরুতেই মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ভর্তি করার চেষ্টা করেন। কিণ্ডার গার্টেন ছাড়া প্রাথমিক স্কুলের বেশীর ভাগ সরকারী। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক। সার্বজনীন শিক্ষার আদর্শে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সন্দেহ নেই, ব্যবস্থাটি উত্তম। কিন্তু কথায় বলে, "মাগ্না গরুর দাঁত নেই।" বেশীর ভাগ সরকারী প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা তাই। এ সব স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা নিয়মিত মোটামুটি ভাল বেতন পান। কিন্তু নিয়মিত ভাল পড়ান না। যখন খুশী এবং যেমন খুশী পড়া চলে। ফলে পঞ্চম শ্রেণী পাস করার পর ভিন্ন স্কুলে ভর্তি করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য মাধ্যমিক স্কুল, যেগুলোতে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীও আছে সেগুলোর অবস্থাও প্রায় একই রকম। পড়াশুনার মান এত নিম্নস্তরের যে কোন মা-বাবাই পারতপক্ষে ভিড় জমাতে চান না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভর্তি সংকটের আসল সমস্যাটা এখানেই। স্কুল যথেষ্টই আছে, কিন্তু ভাল স্কুল নেই। তাই তিন-চারটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর এত ভিড়। আর এ নিয়েই যত কাসুন্দি। এর প্রতিকার করতে হলে সব স্কুলকে মোটামুটি ভাল স্কুলে পরিণত করতে হবে।

বেসরকারী এবং নিম্নমানের স্কুলগুলোকে ভাল করার প্রধান অন্তরায় অর্থনৈতিক। যদিও একমাত্র বাধা নয়। একটি ভাল স্কুলের জন্য কতগুলো জিনিস অপরিহার্য। যথা, ভাল এবং নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, ছোট-খাটো হলেও একটা লাইব্রেরী, বিজ্ঞানের সাজ-সরঞ্জাম এবং খেলাধুলোর উপকরণ প্রভৃতি। চিত্তের প্রফুল্লতা জ্ঞান সঞ্চয়ের একটি উপায়। খেলাধুলা চিত্ত প্রফুল্ল রাখে। শুধু তাই নয়, সৃষ্টি করে সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব। পক্ষান্তরে লাইব্রেরী জ্ঞানের ভাণ্ডার। সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে যুগে যুগে মানুষ যা ভেবেছে তা লেখা থাকে বই-পুস্তকে। রবীন্দ্রনাথ তাই লাইব্রেরীকে মহাসাগরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সহস্র জলস্রোত যেমন সাগরে এসে মিলিত হয়, তেমনি শত জন্মের জ্ঞান পুঞ্জিভূত থাকে পাঠাগারে।" কিন্তু বেশীর ভাগ স্কুলেই লাইব্রেরী ও খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম নেই। তাই অবকাশ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান চর্চা ও বিমল আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ বঞ্চিত হয়ে নষ্টামিতে সময় কাটায়। এ ক্ষেত্রে আরও একটি কথা বলার আছে। কথাটি অপ্রিয়। তবুও বলা দরকার। কথায় আছে, 'দেখে যদি ভক্তি না হয় শুনে মন ভরে না।' আগে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের চলনে-বলনে এবং এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদে একটা উন্নত রুচি ও শালীনতা বোধ ছিল। ছেলেবেলায় আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি কোন সময়ই দামী কাপড়-চোপড় পড়তেন না। কিন্তু যা-ও পড়তেন তা-ও দেখার মত মনে হতো। স্কুলে তার আসা মাত্র এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হতো যে আমাদের অজান্তেই আমরা ভক্তিতে নত হয়ে পড়তাম। সেকাল আর একালে বহু প্রভেদ, এ ঠিক। তখন যে জামা-কাপড় ছিল, মানুষের রুচিবোধ ছিল এখন তা নেই। সময়ের ধারায় বহু কিছুরই বিবর্তন হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, শাশ্বত মূল্যবোধগুলোও হারিয়ে যাবে। কিংবা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা, এমনভাবে আসবেন যে দেখামাত্র ভক্তির চেয়ে অভক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ভর্তি সংকট সম্পর্কিত আলোচনায় কথাগুলো বেমানান মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। স্কুলগুলোর অবস্থার উন্নতি এ সমস্ত কিছুর উপর নিভরশীল। শুধু অর্থ-কড়ির নয়।

বেসরকারী স্কুলগুলোর অর্থ সংকট আছে। এ সংকট দূর করার জন্য, বিশেষতঃ শিক্ষকরা যাতে নিয়মিত বেতন পান এর জন্য সরকারীভাবে বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ অনুদান দেয়া হয়। এর অর্থ অন্ততঃ ৭০ ভাগ বেতন প্রাপ্তি নিশ্চিত। বাকী ৩০ ভাগের সংস্থানসহ অন্যান্য ব্যয়ের সংস্থান করাও দুঃসাধ্য নয়। এই ঢাকা শহরেই মতিঝিল এলাকায় একটি মাধ্যমিক স্কুল আছে। এর প্রাথমিক সেকশনও আছে। স্কুলটি বেসরকারী।

কিন্তু যে কোন দিক হতে যে কোন উন্নত মানের সরকারী স্কুলের সাথে পাল্লা দিতে সমর্থ। ভর্তির সময় এ স্কুলটিতে প্রচণ্ড ভিড় জমে যায়।

কর্তৃপক্ষ রীতিমত হিমসিম খেতে থাকেন। এর কারণ, স্কুলটির অবস্থান বা অন্যকিছু নয়। ভাল স্কুল হিসেবে নাম-ডাক। গোটা দেশে এ স্কুলটি একটি অন্যতম আদর্শ স্কুল হিসেবে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা আধিভৌতিক কোন প্রভাবে নয়। শৃংখলাবোধ থেকে আরম্ভ করে সব ক্ষেত্রে এ স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছেন। তাদের এ চেষ্টা অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে বেসরকারী হওয়া সত্ত্বেও এ স্কুলে অন্যান্য স্কুলের মত সমস্যা নেই। আমরা মনে করি, অপরাপর স্কুলসমূহ যদি এ থেকে শিক্ষা নেয় তাহলে পরিস্থিতি উন্নত হতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে সরকারেরও কিছু করার আছে। অনুদান দেয়াই শেষ কথা নয়।

অনুদানের লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কি-না তা-ও দেখা উচিত। কিন্তু শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তা দেখেন, বাস্তব অবস্থা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর যায় না বলেই সংকট বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে ইদানীং সৃষ্ট একটি সমস্যার বিষয়ও বিবেচ্য। একটি মহল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ডোনেশন' প্রথা চালু করার চেষ্টা করছেন। এ চেষ্টার অর্থ গরীবের ছেলেকে আরও বঞ্চিত করা। শতকরা ৯০ ভাগ অভিভাবক উচিত ব্যয়ই বহন করতে পারে না। এরা ডোনেশন দিয়ে বিশেষ সুবিধার অংশ ভাগী হবে কি করে? আমরা এ প্রথা প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী। শিক্ষা ক্ষেত্রে এমনি বৈষম্যের অন্ত নেই। নি-খরচার শিক্ষা, কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষা, ক্যাডেট স্কুলের শিক্ষা প্রভৃতি নানা বৈষম্যমূলক শিক্ষার নিষ্পেষণে ধনী-গরীবের শিক্ষার ব্যাপক হেরফের সৃষ্টি হচ্ছে।' এর উপর আর একটা বৈষম্যের ভিত্তি তৈরী করার কোন অর্থ নেই। স্বাধীন দেশের জন্য এ বাঞ্ছিতও নয়। তাই আমরা মনে করি, কোন মহল যাতে নতুন সংকট সৃষ্টি করতে না পারে তৎপ্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।